লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা ও গার্সিয়া মার্কেস

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের রচনায় উন্মোচিত বাস্তবতা নিয়ে এযাবৎ আলোচনা হয়েছে প্রচুর। এবং বেশিরভাগ আলোচকই নিবিষ্ট তাঁর যাদু বাস্তবতা (magic realism)-র বিষয়ে। কেউ বা সপ্রশংস লাতিন আমেরকিার রাজনৈতিক বাস্তবতা political r ealism-য় তাঁর অভিনিবেশ লক্ষ করে। কিন্তু আলাপচারিতায় গার্সিয়া মার্কেস বলেছেন, একটিমাত্র বাস্তবতার চর্চাতেই তিনি নিবিষ্ট ছিলেন ও আছেন-- তা হোল, লাতিন আমেরিকার সামগ্রিক বাস্তব। বঙ্গানুবাদে তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটি এরকম ঃ ‘আমার দেশের শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবের প্রতিই আমি দায়বদ্ধ নই। আমার দায়বদ্ধতা এই দুনিয়ার সামগ্রিক বাস্তবের প্রতি।’

যথারীতি এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, গার্সিয়া মার্কেসের রচনায় এই সামগ্রিক বাস্তবের রূপটি কেমন। এ প্রসঙ্গে গার্সিয়া মার্কেসই কিছুটা পথ দেখান আমাদের ঃ ‘আমাদের বাস্তব একেবারেই বেঢপ, সামঞ্জস্যহীন একটা ব্যাপার।’ বলা বাহুল্য, ক্যারিবীয় উপকূল সংলগ্ন কোলোম্বিয়ার মানুষ হিসেবে গার্সিয়া মার্কেস আশৈশব পরিচিত সম্ভব-অসম্ভবে গড়া এমন এক বাস্তবের সঙ্গে যার মূল সুর ’disproportion’, যা আমাদের বাস্তবতা বিষয়ে সনাতন ধারণাকে চ্যালেঞ্জকরে। কারণ তিনি স্মৃতিতে ধারণ করেছেন একুয়াদোর-এর হেনেরাল গার্সিয়া মোরেনো-কে যাঁর বর্মখচিত পদকভূষিত মরদেহ বসানো ছিল সিংহাসনে। তাঁর চেতনায় জেগে আছেন প্রায় প্রবাদে পরিণত হওয়া চিলে-র প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আইয়েন্দে। তিনি কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না কুহকী আবেশজড়ানো লাতিন আমেরিকার দৈনন্দিন বাস্তব, যেখানে কিছু মানুষ শুধু প্রার্থনা করেই গোর কান থেকে বের করে আনে অসংখ্য ক্ষতিকর কীট।

গার্সিয়া মার্কেস তাঁর প্রত্যক্ষ করা এই জীবনকেই তুলে এনেছেন যথার্থ শিল্পীর সংবেদনায়, অহেতুক বর্ণিল আরোপ ছাড়া। একইসঙ্গে সচেষ্ট থেকেছেন এর অন্তর্গূঢ় নানা বিষয়কে ধরার। এভাবে বিবেকী সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য, সময় ও সমাজের কণ্ঠস্বর হয়েও ওঠা। ‘একজন শিল্পী তাঁর দেশ ও শ্রেণীকে যা-কিছু প্রভাবিত করে, তারই সংবেদী গ্রহীতা। তিনিই তাঁর দেশ ও শ্রেণীর শ্রবণেন্দ্রিয়, তার হৃদয়, তার কালের কণ্ঠস্বর’ -- ম্যাক্সিম গোর্কি-র এই স্মরণীয় উক্তিটির (উৎস ঃ কিভাবে আমি লিখতে শিখলাম / বিষয় সাহিত্য / দশম খন্ড) প্রাসঙ্গিকতাই আমরা অনুভব করতে পারি গার্সিয়া মার্কেস-চিত্রিত বাস্তবতার অনুষঙ্গে।

দুই

রাজনৈতিক প্রসঙ্গে যদিও গার্সিয়া মার্কেসের পক্ষপাত সমাজতন্ত্র (Socialism)-এর প্রতি, কিন্তু সাহিত্যসৃজনে তিনি স্তঙ্গপ্পপ্পনব্ধব্ধন্দবস্ত পুনব্ধন্দবস্তুব্ধস্তুজন্দ-কে সমর্থন করেন নি। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধতায় চালিত committed literature -সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, এর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক কোন প্রাপ্তি ঘটাতে পারে না। এতে চেতনা জাগরণের প্রক্রিয়ায় গতি আসার বদলে গতি মন্থরতাই জাগবে, (পেয়ারার সুবাস,)

গার্সিয়া মার্কেসের অনুভবে, লাতিন আমেরিকার মানুষ উপন্যাসে-গল্পে শুধু নিপীড়ন, অবিচারের বিষয়টাই প্রত্যাশা করে না, তাদের আকাঙ্খা আরো বেশী। আঁকড়া রাজনৈতিক বাস্তব বিষয়ে সাধারণ মানুষের অনাগ্রহের কারণ হিসেবে গার্সিয়া মার্কেস শাসকবর্গের অনাচারের সঙ্গে তাদের অতিপরিচয়টাকেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর অনেক বিপ্লবী বন্ধু প্রায়ই নাকি তাঁকে বলতেন, তাঁরা চান লেখকদের লেখার বিষয় বেঁধে দেওয়া হোক। গার্সিয়া মার্কেসের সিদ্ধান্ত, এও আদতে একটা reactionary stand বা প্রগতিবিরোধী মনোভাব। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মতটি ব্যক্ত করেন এভাবে ঃ ‘আমার বিশ্বাস, একটি প্রেমের উপন্যাস আর কোন উপন্যাসের মতোই গ্রহণযোগ্য। ব্যাপারটা যখন এরকম, তখন লেখকের বৈপ্লবিক কর্তব্য হল ভালোভাবে লেখা,’ সুতরাং immediate political reality যে গার্সিয়া মার্কেসের লক্ষ্য নয়, তা তাঁর জবানীতেই স্পষ্ট।

তিন

রাজনৈতিক বাস্তবকে গার্সিয়া মার্কেস এড়িয়েও যাননি তা বলে। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবও নয়, যেহেতু তাঁর স্বভূমি কোলোম্বিয়া চিরকালই রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত একটি দেশ। তাঁর শৈশবের অনেকখানি জুড়ে আছেন যে মাতামহ, কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেস মেহিয়া প্ল (Colonel Nicolas Ricardo Marquez Mejia),তাঁর কাছেই গার্সিয়া মার্কেস শুনেছেন সহস্র দিনের যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০২) বৃত্তান্ত, যা কনজারভেটিভ ও লিবারলদের

মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর মধ্যে সব থেকে রক্তক্ষয়ী। সেই যুদ্ধে লিবারালদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষেরা, আর কনজারভেটিভদের শক্তি যুগিয়েছিল জমিদার ও গীর্জার পুরোহিতশ্রেণী। শোনা গারিবাল্‌দি (১৮০৭-৮২)-র জীবন ও ফরাসী আমূল সংস্কারবাদে (radicalism)-এ প্রাণিত যুবকেরা লাল জামা পরে হাতে পতাকা নিয়ে চলেছিল যুদ্ধে প্রাণ দিতে লিবারেল কম্যান্ডার হেনেরাল রাফায়েল উরিবে উরিবে (General Rafael Uribe)-ছিলেন তাদের পরিচালক। এই প্রবাদপ্রতিম সেনানায়কের ব্যক্তিত্ব ও তার শারীরিক ও আচরণগত নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ গার্সিয়া মার্কেসের ‘একশো বছরের নিঃসঙ্গ তা’র অন্যতম চরিত্র কর্নেল আউরেলিয়ানো বোয়েন্দিয়া।

গার্সিয়া মার্কেসের জন্মের বছরটিও (১৯২৮) ঐতিহাসিক দিক থেকে গুত্বপূর্ণ। কারণ ঐ বছরেই তাঁর জন্মভূমি আরাকাতাকা (Aracataca)-য় মার্কিন পরিচালিত ‘ইউনাইটেড ফ্রন্ট’ (যার প্রতিষ্ঠা ১৯১০-এর কাছাকাছি কোন সময়)-এর ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চলেছে। সেই গণহত্যার বিবরণও তঁাকে শুনিয়েছিলেন মাতামহ কর্নেল মার্কেস। এই বিবরণ শোনার অভিজ্ঞতা তাঁকে কিভাবে প্রভাবিত করেতো গার্সিয়া মার্কেস জানিয়েছেন আপুলেইও মেনদোসা-কে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে ঃ ‘আমার কাছের মানুষেরাই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের হয়ে সাফাই গাওয়া ছেড়ে বিদ্রোহের পক্ষে ঝুঁকতে আমাকে বাধ্য করে,’ স্মর্তব্য যে, এই গণহত্যার বর্ণনা আছে ‘একশো বছরের নিঃসঙ্গতা’-র পাতায়। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে হোসে আর্কাদিও সেগুনদোর স্মৃতিতে জেগে থাকা সেই গণহত্যায় মৃতদেহের নিয়ে একটি গাড়ির সমুদ্রের দিকে দুঃস্বপ্নের যাত্রার কথা,মৃতদেহগুলোকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্ত।

সচেতন হবার পর গার্সিয়া মার্কেস কোলোম্বিয়ার যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী তার মধ্যে গুত্বপূর্ণ ১৯৪৮-এ বামঘেঁসা পপুলিষ্ট হোর্হে এলিলিয়ের গাইতান (Jorge Elicier Gaitan)-এর হত্যাকান্ড। গাইতান-এর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে সারা কোলোম্বিয়া জুড়ে অ স্থিরতা জাগল। লাগামছাড়া হয়ে উঠল হিংসা। প্রায় দেড় লাখ মানুষ প্রাণ হারালো। সাধারণ মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে ক্রোধে। আক্রান্ত হল মার্কিন দূতাবাস। বোগোতা-য় দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক ভেস্তে গেল। সেই অস্থিরতা শেষ হয় হেনেরাল রোহাস পিনিইয়া (General Gustavo Rojas pinilla)-র একনায়কতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু পিনিইয়া মাত্র চার বছরের বেশি থাকতে পারলেন না ক্ষমতায়। অচিরেই ঘুষখোর ও তীব্র ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠায় তাঁকে উৎখাত করা হোল। কনজারভেটিভ ও লিবারালদের এলিটশ্রেণী এরপর যৌথভাবে ন্যাশনাল ফ্রন্টের কায়দায় রাষ্ট্রপতির পদে ক্রমান্বয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়ে চললেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ অবধি। কিন্তু দেশে বঞ্চনা-শোষণ এসবের তেমন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটল না। বন্ধ হল না গেরিলা যুদ্ধ, মানবাধিকার লঙঘন, ড্রাগ ব্যবসা, চোরাচালান। আর, আজকের কোলোম্বিয়া তো এসবের উর্বর ক্ষেত্র। বর্তমান রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেস পাসত্রানা (Andres Pastrana) নাজেহাল হয়ে উঠেছেন নানা সমস্যায়। গার্সিয়া মার্কেস্ এই প্রেক্ষিতেই তাগিদ বোধ করেন ‘একটি অপহরণের প্রতিবেদন’ (News of a kidnapping) এর মতো উপন্যাস লেখার। এই উপন্যাসের বাস্তবকে বুঝতে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি [illegible] থেকে [illegible] -এর একটি রিপোর্টের কিছু অংশ ঃ

[illegible] যথারীতি [illegible]-এর পাতায়-পাতায় ফুটেছে কোলোম্বিয়ার এই হিংসা ও সন্ত্রাসপীড়িত জনজীবনের ছবি। [illegible] কোকেনচক্রের ধনকুবের পাব্লো এসকোবার (Pablo Escobar)-এর গুন্ডাবাহিনী কোলোম্বিয়া-র বিশিষ্ট মানুষদের অপহরণের যে চক্রান্ত করছিল তারই পরিণামে অপহৃতা হন মারুহা পাচোন্ (Maruja Pachon) যিনি চলচিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারপুষ্ট সংস্থা [illegible]-এর ডিরেক্টর। গার্সিয়া মার্কেসের উপন্যাসটি উন্মোচিত করেছে তাঁর দীর্ঘ ছ'মাসের বন্দীদশার যন্ত্রণা এবং তাঁর আত্মীয়, বন্ধু ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের তাঁকে মুক্ত করার প্রয়াসের অনুপুঙ্খ। এসবের উপস্থাপনায় সাংবাদিক গার্সিয়া মার্কেস ঔপন্যাসিক গার্সিয়া মার্কেসকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই লেখক [illegible] এর দিকে বেশি ঝুঁকেছেন এখানে। তাঁর ভাষাও জীবনের বাস্তবকে যতটা ধারণ করেছে কাব্যকে ততটা নয়। বস্তুত সময়ের চাপই এর কারণ।

এভাবে, জনজীবনে আলোড়ন জাগানো ব্যাপার নিয়ে গার্সিয়া মার্কেস লিখে চলেছেন সুদূর অতীত থেকে--সেই যখন [illegible]-এর সাংবাদিক ছিলেন, তখন থেকে প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত। ১৯৫৫-র ২৮ ফেব্রুয়ারী কোলোম্বিয়ান নেভির ডেস্ট্রয়ার ‘কালদাস’ (Caldas) থেকে জলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে যায় আটজন নাবিক। ডেস্ট্রয়ারটি তখন কোলোম্বিয়ান পোর্ট অব কার্তাহেনা-য় যাচ্ছিল। ঘটনার দশদিন পরে লুইস্ আলেহানদ্রো ভেলাস্কো (Luis Alejandro Velasco) নামে এক নাবিক জলে ভেসে জীবিত ফিরে এলে গার্সিয়া মার্কেস তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন। [illegible]-এর পাতায় নাবিকটির মৃত্যুকে জয় করার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ামাত্র ঘটনাটা নিয়ে সরকারের দেওয়া বিবৃতির নানা অসংগতি ধরা পড়ল। জানা গেল, সামরিক জাহাজটিতে করে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস (যেমন, রেফ্রিজারেটর, টি.ভি. সেট, ওয়াশিং মেশিন) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যা একেবারে বেআইনী। এতে জাহাজটির ওজন এত বেড়ে যায় যে, নাবিকদের উদ্ধারের কাজটাই শু করা যায়নি। এবং সরকারী বিবৃতি যাই হোক, সেদিন ঝড়ের নামগন্ধ ছিল না। হেনোরাল গুস্তাভো পিনিইয়া-র এককনায়কপন্থী সরকারেরপক্ষে ব্যবপারটা খুবই অস্বস্তিকর। এই সেই পিনিইয়া যিনি ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বেপরোয়া গুলি চালানোর হুকুম দিয়েছিলেন, রবিবারের বুলফাইট ফ্যানদের কেউ একজন বুলরিং-এ তাঁর মেয়েকে টিটকারি দেওয়ায় এক অজ্ঞাত সংখ্যক বুলফাইট ফ্যানকে সিক্রেট পুলিশ পাঠিয়ে হত্যা করতে যার বিবেক দংশায়নি। ফলে এক অমোঘ নিয়মেই নেমে এল সরকারী আঘাত। এ প্রসঙ্গে গার্সিয়া মার্কেসের স্মৃতিচারণ, ‘একনায়ক সরকার আঘাতটির মোকাবিলা করলেন তাৎক্ষণিক কিছু প্রত্যাঘাত দিয়ে। এর ফলে ক'মাস বাদেই বন্ধ হয়ে যায় ‘এল এসপেক্তাদোর’। বহু চাপ, শাসনি ও লোভনীয় ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধের চেষ্টা সত্বেও লুইস আলেহান্দ্রো ভেলাস্‌কো তার দেওয়া বিবরণের একটি শব্দও প্রত্যাহার করতে রাজি হলো না। তাকে নৌ-বাহিনীর চাকরি ছাড়তে হয় এজন্য। রোজগারের এই একটি উপায়ই ছিল তার। প্রাত্যহিকতার বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেল সে, (জাহাজ থেকে জলে পড়ে যাওয়া এক নাবিকের কাহিনী, The Story of a shipwrecked Sailor,

এভাবে প্রথম থেকেই রক্ষণশীল শাসন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নিয়ে গার্সিয়া মার্কেস লিখেছেন নির্ভীকভাবে। কিন্তু তাঁর কাহিনীর পটে রাজনৈতিক বাস্তবটাই সব নয়।

স্লোগানধর্মী বা রাজনীতিসর্বস্ব -- এই শব্দে কিছুতেই আক্রমণ করা যাবে না তাঁর লেখাকে। এটা ঘটনা যে, কোলোম্বিয়া-র দক্ষিণপন্থীরা কোনকালেই গার্সিয়া ম ার্কেসের অভিপ্রায়কে ভালো চোখে দেখেনি, যেহেতু মধ্য আমেরিকায় কোন্‌ত্রাদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে নিকারাগুয়া, এল সারভাদোর, গুয়াতেমোলা বা ওন্দুরাস্‌-এ ম ার্কিনদের আগুন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টার বিদ্ধে তাঁর কলমে ধিক্কার ফুটেছে। তবু গার্সিয়া মার্কেস আদৌ আগ্রহী নন বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিষ্ঠায়। অ াসলে তাঁর বিচরণ আরো গভীর কোন বাস্তবে, যে বাস্তবে মানুষই সত্য। অমানবিক শাসনে মানুষ কেমন আছে, তাদের অন্তর্গত আর্তনাদ, আকাঙ্খা, স্বপ্ন, ব্যর্থতার চেহারাটা কেমন, এসবই গার্সিয়া মার্কেসের চর্চার বিষয়। এমনকী স্বৈরাচারী শাসক চরিত্রও তাঁর কলমে ফুটেছে সত্যি মানুষ হিশেবে, আলো-আঁধারির রঙে। আর এভাবেই সম্ভব হয়েছে এক বিশেষ সমাজ ও সময়ের সামগ্রিক রূপায়ণ। একটি সমাজ তার আশ্চর্য বহুরূপতা নিয়েও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে সমগ্রতার সৌন্দর্য। এই অতিরিক্ত গুণের সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক নানা বিষয়ের যথাযথ বিন্যাসের ফলেই।

চার

শুধু কোলোম্বিয়ার নয়, লাতিন আমেরিকার অন্য কিছু দেশের বাস্তবও গার্সিয়া মার্কেসের অভিনিবেশের পরিধিতে এসেছে। যেমন, 'মিগেল লিত্তিনের অভিযান, চিলে-তে গোপনে' (The Adventure of Miguel Littin, Clandestine in Chile, 1986) এখানে এক স্বৈরাচারী শাসকের আমলে দক্ষিণ আমেরিকার এক গুত্বপূর্ণ দেশের বিপন্ন মানবাত্মার অবরুদ্ধ কান্নাকে লেখক তুলে এনেছেন শ্রবণের মাত্রায়। রিপোর্টাজ ঢঙে লেখা হলেও এর উপস্থাপনায় অ াছে অসামান্য ব্যঞ্জনার দ্যুতি, যা উপন্যাসটিকে সহজেই বস্তুগত সীমা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।

চিলে থেকে নির্বাসিত পরিচালক মিগেল লিত্তিন দীর্ঘ বারো বছর পর স্বদেশে ফিরেছিলেন মিথ্যে নাম ও অতীত, জাল পাসপোর্ট ও নকল বউ নিয়ে, বিশ্ববাসীকে স্বৈ রচারী পিনোচেত-এর জামানায় চিলে-র অবস্থা চিত্রায়িত করে দেখানোর জন্য। গার্সিয়া মার্কেসকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারনির্ভর উপন্যাসে সে দেশের র াজনৈতিক বাস্তব প্রকাশ পেলেও চিলে-র মানুষের নানা যাপনকর্ম, সেই সঙ্গে তাদের অস্তিত্বের যন্ত্রণাই গুত্ব পেয়েছে প্রধানত। সেখানকার গরীব মানুষ, যারা পিনে াচেত-এর জমানায় মহানুভব সালভাদোর আইয়েন্দের স্মৃতি আঁকড়ে পড়েছিল, তারা ঠিক কেমন ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হচ্ছিল সবসময়, তার একটি নমুনা ঃ 'মাথার ওপরের ছাদ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই আমরা। ওরা বরং আমাদের মর্যাদাটা ফিরিয়ে দিক। আমরা শুধু তাই চাই যা ওরা কেড়ে নিয়েছে আমাদের কাছে থেকে-- আমাদের জীবনের বিষয়ে মতপ্রকাশের অধিকার।' উপন্যাসটিতে চিলে-র যুবাগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণেও আমরা একটি দেশ ও কালের সমাজ ও সভ্যতার চেহারাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি উদাহরণ ঃ 'অল্প বয়স সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের চেতনায় জেগে আছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মামুলি এক ধারণার অতিরিক্ত কিছু। ত াদের ইতিহাস বহু অনামীর কীর্তি ও গোপন সাফল্যে ভরা, যা ওরা রক্ষা করে এসেছে গভীর বিনয়ের সঙ্গে।' আসলে গার্সিয়া মার্কেস এই ধারণায় স্থিত যে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের গূঢ় সত্যটিকে চিহিত করার ভেতর দিয়েই বাস্তব-রূপায়ণ সম্পূর্ণতা পায়। তাই তিনি মিগেল লিত্তিনের সাক্ষাৎকারে বলা সেই সব কথাগুলোকে গুত্ব দেন যাতে ব্যক্তি ও পরিবেশের দ্বন্দ্বনির্ভর সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়েছে। সেই সঙ্গে ফুটেছে এক অসমন্বয়ের যন্ত্রণার্ত ছবি।

'অশুভ সময়ে' (In Evil Hour) উপন্যাসটিতে লেখক দক্ষিণ আমেরিকার এক নামহীন দেশের নামহীন শহরের কথা বলেন যেখানে অসহ্য উত্তাপ নিয়ে জাঁ কিয়ে বসেছে শরৎকাল। মাঝে মাঝে সেখানে মুষলধারে বৃষ্টির দাপট। শহরের গির্জায় ইঁদুরের দৌরাত্ম্য খুব। যেন গীর্জার ভিত নাড়িয়ে দেয় ইঁদুর। বহুদূর থেকে নিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারী শাসনের কঠোরতায় নাভীশ্বাস ওঠে সাধারণ মানুষের। হতভাগ্য সেদেশের সরকার ছাড়া আর কিছুই বদলায় না। এবং সরকারও বদলায় ঘন-ঘন--অবশ্যই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে। এমন পরিবেশে কারা যেন বাড়ির দরজায়-দরজায় শাসকদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া সেঁটে বেড়ায়। শহরে দন্ডমুন্ডের কর্তা মেয়রমশাই-যিনি শহরের পুলিশপ্রধানও বটে-অনিদ্রার জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠেন। হঠাৎ একদিন সংঘাতে-সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস। পেপে আমাদের মারা যায়। জেলখানা উপছে পড়ে বন্দীতে। জঙ্গলে পালায় মানুষ। গেরিলা যোদ্ধার দল ভারী হয়।

এভাবে উপন্যাসটি কোন নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট কোন অনাচারপীড়িত সময়কে ধরছে না বলেই মনে হয়। সব দেশের সব খারাপ সময়কেই এটি তার লক্ষ্যবস্তু করে নিয়েছে যখন অবিশ্বাস, গোপন অপরাধ, দুর্নীতি, দ্বিচারিতা, চাটুকারিতা, গুজব ইত্যাদির প্রকোপ চরমে পৌঁছায়। প্রচুর রক্ত, গা গুলিয়ে দেওয়া ঘৃণ্য নানা অপরাধের খবরে জর্জরিত হয় পরিবেশ। 'অশুভ সময়ে' -তে এসবই আছে। একই সঙ্গে আছে অসামান্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও হাস্যরসের মাধ্যমে লেখকের ক্রোধ ও ঘৃণার সংযত প্রকাশ। উপন্যাসে শহরটির বহুমাত্রিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায়, তাতে সেখানকার মানুষের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ, রাজনৈতিক সংবেদনা, রসবোধ, ক্রোধ, যন্ত্রণা, ধর্মীয় বিশ্বাস, নান্দনিক চাহিদা, সাধারণের ওপর গীর্জায় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়কেই ছুঁয়ে গেছেন লেখক। এবং বাস্তবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক-দুটি দিককেই সমগুত্বে স্থান দিয়েছেন কাহিনী-বিন্যাসে। ইতিবাচক প্রগতিশীল বাস্তব স্পষ্ট হয়েছে ফাদার আনহেল-এর রূপায়ণে, ডাক্তার হিরালদো-র শান্তি পতিব াদে। প্রসঙ্গত উপন্যাসটির মহামুহূর্তটি একবার স্মরণ করা যেতে পারে। পটভূমি ঃ পেপে আমাদের-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং ময়নাতদন্ত ছাড়াই মেয়রের তা দাহ করানোর নির্দেশ।

--'আসুন লেফটেন্যান্ট, আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাক.......ময়না তদন্তটা করতেই হবে। এই জেলে কয়েদীরা কেন দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই রহস্যও সমাধান করবো আমরা, ' কথাটা হিরাল্‌দো মেয়রের উদ্যত কারবাইন-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। ক্ষীণ প্রতিবাদেই গুলি ছুঁড়তে উদ্যত মেয়রের সামনে থেকে সরে এসে হিরাল্‌দো এরপর ফাদার আন্‌হেল-এর কাঁধে চাপড় মেরে যখন বললেন, 'অবাক হবেন না ফাদার, এসব জীবনেরই অঙ্গ, তখন কথাসাহিত্যের সত্যনিষ্ঠ চরিত্রটি আভাসিত হয়।

পাঁচ

'কুলপতির হেমন্ত' (The Autumn of the Partiarch, 1975) উপন্যাসে গার্সিয়া মার্কেসের বিষয় স্বৈরাচারী শাসক চরিত্র। যথার্থ স্বেচ্ছাচারী শ াসকের অভাব কোনদিনই ছিল না দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশগুলোতে। তাদের রক্তক্ষয়ী অত্যাচার ও খামখেয়ালিপনার অতিরেকে গার্সিয়া মার্কেসের বল া গ্ন'স্তুব্ধ স্পন্দ্রপ্তপ্ত স্মাজস্পন্দস্তজন্ধনক্ষ' -এর কথাই মনে আসে। প্রা উঠতে পারে, গার্সিয়া মার্কেস কেন স্বৈরাচারী শাসকদের নিয়ে লেখা শু করলেন, কিংবা স্বৈ রাচারী চরিত্রের ঠিক কোন দিকটি তাঁর প্রণোদনার কাজ করেছে। প্রথমটির উত্তর আছে তাঁর সাংবাদিক জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার মধ্যে। ১৯৫৮-য় ভেনেসুয়েল

া-র স্বৈরাচারী শাসক পেরেস হিমেনেস্ (Peres Jimenes) পরিচালিত সরকারেরপতন তিনি যখন চাক্ষুষ করেছিলেন, তখন ছোটখাটো নানা দৃশ্য তাঁকে কিছু ভাবনার দিকে ঠেলে দেয়। একটি ভাবনার বিষয় mystery of power উল্লেখ্য যে, গার্সিয়া মার্কেসের সব ভাবনার মূলেই রয়েছে কোন-না-কোন ঘটনার অনুষঙ্গ।

পেরেস হিমেনেস দেশ ছেড়ে পালানোর দু-তিন দিন পর সামরিক প্রধানরা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে মিলিত হন দেশে কিভাবে নতুন সরকার গড়া হবে সে নিয়ে আলোচনা করতে। অন্যান্য সাংবাদিকদের সঙ্গে গার্সিয়া মার্কেস ও সেদিন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন, কী ঘোষণা হয় তা শোনার জন্য। এমন সময় হঠাৎ আলোচনা কক্ষের দরজা খুলে গেল। একজন যুদ্ধক্লান্ত অফিসার মেসিনগান উদ্যত করে দরজার দিকে মুখ করে পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে এলেন। ঘরের কার্পেট ভরে গেল তার জুতার কাদায়। পিছু হটতে-হটতেই তিনি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গিয়ে চড়ে বসলেন গাড়িতে। গাড়ি চেপে সোজা এয়ারপোর্ট। অর্থাৎ নির্বাসনে। দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে গার্সিয়া মার্কেসের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া -- 'হঠাৎ আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হোল ক্ষমতার রহস্য।' তিনি ভাবলেন, 'লাতিন আমেরিকার ডিক্টেটরকে নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি এখনও।' মিগেল আনহেল আস্তুরিয়াস (গুয়াতেমোলা, ১৮৯৯-১৯৭৪)-এ 'এল সেনিওর প্রেসিদেন্তে' তাঁর ধারণার অসম্পূর্ণ।

ইতিমধ্যে গার্সিয়া মার্কেস নিবিষ্ট চর্চার সীমায় এনে ফেলেছিলেন লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় নানা দেশের একনায়কদের জীবনবৃত্তান্ত। দেখেছেন, কতো অদ্ভুত সব কান্ডঘটিয়েছেন ওরা। হাইতি-র দুভালিয়ের দেশের সব কালো কুকুরকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর অন্যতম এক শত্রু গ্রেপ্তার হয়ে খুন হবার ভয়ে কুকুরের রূপ ধারণ করেছে। এল সালভাদোরের মাক্সিমিলিয়ানো এর্নান্দেস্ মার্তিনেস্ জীবাণু সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশের সব আলো লাল কাগজে মুড়ে দেওয়া হোক। গার্সিয়া মার্কেসকে সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল বুঝি ভেনেসুয়েলার স্বৈরাচারী শাসক হুয়ান ভিসেন্তে গোমেস্ যে প্রায়ই নিজের মৃত্যু ঘোষণা করত আর কিছুদিন পরেই 'কুলপতির হেমন্ত'-এর কুলপতির মতো আবির্ভূত হত সশরীরে। আসলে গার্সিয়া মার্কেস বুঝেছিলেন স্বৈরাচারী শাসকদের বাদ দিয়ে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় সমাজজীবনের মর্মমূলে পৌঁছনো যাবে না। স্বৈরাচারী শাসক-চরিত্রের এভাবে সাহিত্যরচনার বিষয় হয়ে ওঠার অন্য একটি দিকও আছে। গার্সিয়া মার্কেসকে একবার প্রশ্ন করা হয়, 'কুলপতির হেমন্ত' (এল ওতোনিও দেল পাত্রিয়ার্কা)-কে একটিমাত্র বাক্যে কীভাবে চিহ্নিত করবেন? গার্সিয়া মার্কেস জবাবে বলেছিলেন 'ক্ষমতার নিঃসঙ্গতা বিষয়ে একটি কবিতা হিসেবে' .... পেয়ারার সুবাস, ঠ্ব্রঞ্চক্লন্তুন্দ্ব ঙ্গন্দ্র ঞ্চড়ন্দ্ব গুক্কহ্ম, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় সাধারণ জনমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গতা ক্ষমতাবান শাসকদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল--এরকমই একটা স্বীকৃতি মেলে গার্সিয়া মার্কেসের কথায়। ঠিক এ-প্রসঙ্গেই মার্কেস বলেন এক ধরনের গ্নপ্তব্রন্তন্স ঙ্গন্দ্র ন্তুঙ্গপ্পপ্পব্তুন্নন্তুব্রঞ্চনঙ্গ -এর কথা। এই গ্নপ্তব্রন্তন্স ঙ্গন্দ্র ন্তুঙ্গপ্পপ্পব্তুন্নন্তুব্রঞ্চনঙ্গ বা প্রবহমান জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সমস্যাই ক্ষমতাবান শাসককে সন্দিহান করে তোলে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে। যেমন, গার্সিয়া মার্কেস-চিত্রিত কুলপতি কোন ব্যাপারেই সুনিশ্চিত নন। সুনিশ্চিত নন তাঁর নিজের নামটা ঠিক তাঁকেই চিহ্নিত করছে কিনা, সে বিষয়েও। কাউকেই যেন বিশ্বাস মনে হয় না তাঁর।

আপুলেইও মেনদোসা (Apuleyo Mendosa) কে দেওয়া সাক্ষাৎসারে গার্সিয়া মার্কেস আরও কিছু বলেছেন যা এ-প্রসঙ্গে পাঠকের ভাবনাকে প্রসারিত করতে পারে। ব্যাপারটা এরকম যে, গার্সিয়া মার্কেস যখন শেষবারের মতো, অবশ্যই প্রকাশের তাগিদে, লিখতে শু করেছেন 'কুলপতির হেমন্ত' উপন্যাসটি (যদিও দীর্ঘকাল ধরে, প্রায় সতেরো বছর, নানা আঙ্গিকে এর নির্মাণ চলেছিল), ততদিনে খ্যাতির স্বাদে পেয়ে গেছেন তিনি। আর এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হচ্ছে, 'খ্যাতির নিঃসঙ্গতা ও ক্ষমতার নিঃসঙ্গতা একইরকম দুর্ভাগ্য,' (পেয়ারার সুবাস, গ্নঠ্ব্রঞ্চক্লন্তুন্দ্ব ঙ্গন্দ্র ঞ্চড়ন্দ্ব গুক্কহ্ম,গ্ন এবং কুলপতি চরিত্রের নিঃসঙ্গতার চিত্রণে লেখক গার্সিয়া মার্কেসের অনুভূতি নিঃসঙ্গতারই ছায়াপাত ঘটেছে বলে নিশ্চিত হবেন পাঠক, যখন তিনি জানবেন লেখক এই উপন্যাসকে চিহ্নিত করেছেন 'একটি স্বীকারোক্তি' , হিসেবে। আপুলেইও মেনদোসা আর এক ধাপ এগিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন, একসময় গার্সিয়া মার্কেসই নাকি এই উপন্যাসকে বলেছিলেন ('An autobiography in code' 'কুলপতির হেমন্ত'-এর সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার পেছনেও বুঝি মহান লেখকের অসামান্য এই উপলব্ধি ঃ 'একজন লেখকের পক্ষে সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি না থাকাটাই অসম্ভব-- চরিত্রটি যতই ঘৃণ্য হোক, কণাবশত হলেও লেখকের মমতা থাকবেই তার প্রতি।'

ক্ষমতাবানের চরিত্রে নিঃসঙ্গতার বাস্তব নিয়ে গার্সিয়া মার্কেসের আরেকটা উপন্যাস 'গোলকধাঁধায় সেনাপতি' (The General in his Labyrinth, 1989).-এর বিষয় লাতিন আমেরিকার সর্বজনপূজ্য বীর চরিত্র সিমোন বোলিভার যিনি স্পেনীয় অপশাসন থেকে লাতিন আমেরিকার বহু দেশকে মুক্ত করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনের কটি ঘটনাবহুল দিন উপন্যাসটির অবয়ব হলেও এর প্রাণশক্তি হল তাঁর গভীর একাকিত্বের উপলব্ধি। বোলিভারের বীর অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে লিপ্ত যে নিঃসঙ্গতা ও বিষাদ, উপন্যাসের পাতায়-পাতায় আছে তারই বিবরণ। একটি উদ্ধৃতি ঃ

'তার বিদ্ধে প্রতিটি হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে সে অক্ষত অবস্থায় পার পেয়েছে, এবং প্রতিবারই নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছিল না বলে তার প্রাণ বেঁচেছে। সঙ্গে কোন রক্ষী নিত না সে। যেখানে যা-ই দেওয়া হোক কেন, তাই সে খেত, পান করত নিদ্বিগ্নভাবে। একমাত্র মানুয়েলাই জানত, এসব ব্যাপারে তারঅনাগ্রহের কারণ তার চেতনারঅভাব, কিংবা অদৃষ্টবাদে আস্থা নয়। এর কারণ তার একটা বিষণ্ণ, স্থির বিশ্বাস যে, হতভাগ্য ও নগ্ন অবস্থায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার সান্ত্বনা না পেয়ে নিজের বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু হবে তার।'

উদ্ধৃত অংশের শেষদিকে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে এক অসমন্বয়ের যন্ত্রণাকে নির্ভার গদ্যে ফোটাতে চেয়েছেন লেখক। উপন্যাসের অন্তিমে সেই অস্তিত্বের যন্ত্রণার ছবি অনেকটাই স্পষ্ট, যখন পাঠক পড়েন,....... ' যেই তার সামনে ভেসে উঠলো একটা সত্য, সে কেঁপে উঠলো। সত্যটা এই যে, তার দুর্ভাগ্য ও স্বপ্নের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা সেই মুহূর্তে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাকিটা শুধুই অন্ধকার।' আর, এরপরই বোলিভার উচ্চারণ করেন ঐতিহাসিক উক্তিটি যা আজো জেগে আছে লাতিন আমেরিকার মানুষের স্মৃতিতে ঃ 'এই গোলকধাঁধা থেকে আমি বের হবো কী করে ?'

বোলিভার-চরিত্রের রূপায়ণে গার্সিয়া মার্কেস অহেতুক glorification-এর পথেও হাঁটেননি। তাকে যথার্থ রক্তমাংসের মানুষ করেই এঁকেছেন। এই কাজে গার্সিয়া মার্কেস কী অসম্ভব তথ্যনিষ্ঠ, সে খতিয়ান আছে এ-বইয়ের শেষ কটি পাতায়। বাস্তবিকই তিনি সত্যতা যাচাই না করে গ্রহণ করেননি একটিও তথ্য। সুদূর

অতীতকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার প্রক্রিয়ায় খানিক কল্পনার আশ্রয় নিতেই হবে লেখককে। গার্সিয়া মার্কেস তাই করেছেন,তবে মূল তথ্যের প্রতি অনুগত থেকে। বোলিভারের তীব্র নারীসঙ্গলিপ্সা এরকম একটি তথ্য। উপন্যাসে আছে, বোলিভারের অন্তিম অসুস্থতার সময় যখন কারো প্রবেশাধিকার ছিল না তাঁর ঘরে, ফের ানান্দা বাররিগা নামে এক নারী সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করে বাধা পেয়ে বলে, ‘এই অনাথ মানুষটা মেয়েছেলে এ্যাতো ভালোবাসতো যে, বিছানারপাশে ওরকম একজন ছাড়া সে মরতে পারে না। এমনকী আমার মতো বুড়ি, কুচ্ছিত,বাতিল মেয়েমানুষ হলেও চলবে।’ বলিভার-চরিত্রের এরকম উপস্থাপনা নিয়ে বির্তকের ঝড় উঠেছিল লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে। কিন্তু আজকের পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন লেখকের একটি মনুষ্যচরিত্রের সামগ্রিক রূপদানের তাগিদটি। নিঃসন্দেহে এটা চরিত্র সৃজনে লেখকের বাস্তবলগ্নতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

ছয়

গার্সিয়া মার্কেসের সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস ‘একশো বছরের নিঃসঙ্গতা’ (One Hundred Years of Solitude, 1968) দুটি কারণে স্মরণীয়। প্রথম কারণ, লাতিন আমেরিকার জনজীবনের অন্তর্গূঢ় নিঃসঙ্গতার বাস্তব তাঁর আর কোন রচনায় এমন তীব্রতায় ফোটেনি। দ্বিতীয় কারণ, উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাসে যাদু-বাস্তবতা বা ম্ণ্ণব্ধন্তুপ্ত জ্ঞন্দ্বপ্তন্দপ্প-এর অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠা।

উল্লেখিত উপন্যাসে বোয়েন্দিয়া পরিবারের পারিব্যাপক নিঃসঙ্গতার উৎস নিয়ে পাঠক মাত্রই কৌতূহলী হবেন। সে-কৌতূহলের উত্তরও গার্সিয়া মার্কেস দিয়েছেন আপুলেইও মেনদোসা - কে দেওয়া সাক্ষাৎকারেই, ‘ বোয়েন্দিয়ারা ভালোবাসতে পারতো না। প্রেমহীনতা তাদের নিঃসঙ্গতা ও হতাশার কারণ,’ (পেয়ারার সুবাস, ঠ্ক্সব্ধব্জুন্তন্দ প্সন্দ্র ঞড়ন্দ গুব্জুঞ্চ এই প্রেমহীনতা আজকের আধুনিক জীবনেরও বাস্তব। কারো মতে, গার্সিয়া মার্সেসের নিঃসঙ্গতা বা ন্দপ্সপ্তন্দস্তুব্ধ- এর নির্মাণ সারা পৃথিবীর সংবেদী, নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গে গ্নত্রপ্সপ্তনস্ত্রজন্দব্ধ-র দ্যোতনা বহন করে।

নিঃসঙ্গতা বিষয়ে গার্সিয়া মার্কেসের চেতনা জেগেছিল অন্যসূত্রে। এ-নিয়ে লেখার প্রণোদনা তিনি পেয়েছিলেন তাঁরপারিবারিক জীবন থেকেই। আপুলেইও মেনদোসার রচনা থেকে জানা যায়, ছোটবেলায় আটবছর বয়স পর্যন্ত দাদুর বাড়িতে থাকতে - থাকতেই তিনি অনুভব করেছিলেন নিঃসঙ্গতার ভার। তাঁর মাসি ফ্রান্সিস্কা সিমোনোসেয়া (Francisca Simonosea) -কে তিনি দেখেলিলেন নিজের শব-আচ্ছাদনী (Shroud) বুনতে। ‘একশো বছরের নিঃসঙ্গতা’য় আমারান্তাকে-ও আমরা দেখি নিজের শব-আচ্ছাদনী বুনে কাটিয়ে দিতে জীবনের বড় একটা অংশ। সানতা সোফিয়া দেলা পিয়েদাদ ও পেরনান্দা দেল কারপিও চরিত্রদুটিতেও গার্সিয়া মার্কেসের ছোটবেলায় দেখা নিকটজনদের চরম নিঃসঙ্গতার ছাপ পড়েছে।

গার্সিয়া মার্কেসের এই নিঃসঙ্গতার বাস্তব-- অন্তত ‘নাবো নামে যে লোকটা দেবদূতদের অপেক্ষায় রেখেছিলো’ বা ‘এক ভূতুড়ে জাহাজের শেষযাত্রা’ গল্পে যেমনটা দেখা গেছে অন্য এক প্রসারিত ধারণা দিতে পারে পাঠককে। পাঠক ভাবতেই পারেন, এই নিঃসঙ্গতা বুঝি একটা ঘেরাটোপ, একটা স্বেচ্ছাবৃত দশা। লাতিন আমেরিকার মানুষ বহুশতাব্দী লালিত সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি মনের গহনে জারিত করে চলেছে আজও। যন্ত্রসভ্যতার তাড়না তাদের ধর্মচ্যুত করতে পারেনি। যন্ত্রসভ্যতা এগোচ্ছে যতো, ততোই তারা আরও দৃঢ় হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্তে। যন্ত্র ও যুক্তিশাসিত দুনিয়ার বিদ্ধে এই চলাটা জন্ম দিচ্ছে এক শান্ত সংঘাতের। এভাবে এক বিরাট ভূ-খন্ডের আজন্মলালিত লৌকিক অলৌকিক নানা সংস্কার-বিশ্বাস আঁকড়ে দূরে থাকার তাগিদ, কিংবা একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা বিশ্বাসে ও চেতনায়, তাদের এমন নিঃসঙ্গতার জনক। তবু, এই নিঃসঙ্গতা অহঙ্কারের। কারণ, এতে আছে বলিষ্ঠআইডেন্টিটির ব্যঞ্জনা।

সাত

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে গার্সিয়া মার্কেস যা বলেছিলেন তার সারবস্তু হল, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের মানুষদের জীবনে যাদু-বাস্তবতা বা magical realism কোন আরোপিত ব্যাপার নয়। এটা তাদের সঙ্গেই বাঁচে সবসময়। প্রতি মুহূর্তে নির্ধারিত করে দেয় অসংখ্য মৃত্যুকেও। গার্সিয়া মার্কেসের ভাষায়, এটা exaggerated proportions. তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, তাঁর রচনায় যাদু-বাস্তবতার পরিচয়বাহী এমন একটি ঘটনাও নেই যা সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু ম্যাজিক রিয়ালিজম্ বা যাদু-বাস্তবতা লাতিন আমেরিকার মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে লিপ্ত একটি ব্যাপার, তাই তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিবেশনে এই বাস্তবতাকে এড়ানো যায়না কিছুতেই। এবং এই বাস্তবতার চিত্রণে সেখানকার সাহিত্যিকদের কোন কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না।

প্রচলিত কৃৎকৌশল যা মূলত পরাবাস্তববাদী ও দাদাবাদীদের দৌলতে ক্রমশ তীব্র সোফিস্টিকেশনের দিকে এগোচ্ছিল, তা দিয়ে, গার্সিয়া মার্কেসের মতে, কিছুতেই ধরা যেত না এই গোলার্ধের বাস্তবকে। বিষয়টি তিনি বিস্তৃত করেছেন এইভাবে যে, য়ুরোপীয় পাঠকের কাছে ‘ঝড়’ শব্দটি যে অর্থ বহন করে, সেই অর্থে তাঁরা তাকে বোঝেন না। একই কথা প্রযোজ্য ‘বৃষ্টি’ শব্দটির ক্ষেত্রেও। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বৃষ্টির ভয়াবহতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই য়ুরোপের মানুষের। ওখানে এমন নদী আছে (আমাজন জঙ্গলের গহনে) যার জল টগবগ করে ফুটছে সর্বক্ষণ (পেয়ারার সুবাস, (Fragrance of the Guava,)। ওখানে জাল ফেলে নদী থেকে তুলেআনতে হয় ঝড়ে উড়ে যাওয়া গোটা একটা সার্কাসের সিংহ ও জিরাফকে। আর অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস তো লাতিন আমেরিকার, বিশেষত ক্যারিবীয় সংস্কৃতি পুষ্ট অঞ্চলের মর্মমূলে। গার্সিয়া মার্কেস এই বাস্তবতা বিষয়ে তীব্র সচেতন হয়েছিলেন আঙ্গোলা ভ্রমণে গিয়ে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘‘লাতিন আমেরিকায় ওরা আমাদের শিখিয়েছিল আমরা স্পেনীয়। কিন্তু সেই আঙ্গোলা ভ্রমণে আমি আবিষ্কার করলাম আমরা আফ্রিকানও বটে। বরং বলা ভালো, আমরা জাতিগতভাবে সংকর, ’। তাঁর বাস্তবকে দেখার সূত্রটি তিনি আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন এরকম কিছু মন্তব্যে, ‘আফ্রিকান ক্রীতদাসদের লাগামছাড়া কল্পনা ও প্রি-কোলোম্বিয়ান আদিবাসীদের বল্গাহীন ভাবুকতা একসঙ্গে মিলেমিশে, উদ্ভট সবকিছুর প্রতি আন্দালুসিয়ান আগ্রহ ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে গালিসীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সৃষ্টি করেছে বাস্তবকে দেখার এক মায়াচ্ছন্ন পদ্ধতি। ......ক্যারিবীয়ানরাই আমায় শিখিয়েছে বাস্তবকে আলাদাভাবে দেখতে, অতিপ্রাকৃতকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ বলে ভাবতে’’।

গার্সিয়া মার্কেসের কল্পিত নগরী ও 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা-র পটভূমি 'মাকোন্দো' (Macondo) এই যাদু বাস্তবতার আদর্শ লালনক্ষেত্র। এটা জিপসিদের প্রিয় আশ্রয়। তাদের প্রধান মেলকিয়াদেস্‌। বোয়েন্দিয়া পরিবারের প্রথম পুষের কথা জানি আমরা, সেই হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিয়ার সঙ্গে গভীর সখ্যতা জন্ম ালো মেলকিয়াদেস্‌-এর। মেকিয়াদেস্‌ হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিয়াকে একটা চর্মপত্র বা পার্চমেন্ট দিয়ে যান। ওতে সংস্কৃতে লেখা ছিল বোয়েন্দিয়া পরিবারের ইতিহাস। সেই পার্চমেন্টের মর্মোদ্ধার খুব দুরূহ এক ব্যাপার। পুষানুক্রমে কতো চেষ্টা চলে, কিন্তু সব বিফলে যায়। শেষ পর্যন্ত রেনাতা রেমেদিওস ও মাউরিসিও বা বিলোনিয়া-র ছেলে আউরেলিয়ানো সফল হল। কিন্তু কি অসম্ভব যন্ত্রণা সেই আবিষ্কারে। আউরেলিয়ানো যখন দেখল বাগানের পাথুরে পথ ধরে ফুলে যাওয়া থলের আকার নেওয়া তার ছেলের শরীর পিঁপড়ের দল বয়ে নিয়ে চলেছে গর্তের দিকে, পার্চমেন্টে লেখা শব্দগুলোর অর্থ ঝলসে ওঠে তার মনে, 'বংশের প্রথমজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে, আর শেষের জন পিঁপড়ের আহার হচ্ছে।'

শেষ বয়সে পাগলামি পেয়ে বসলে বংশের প্রথম পুষ হোসে আর্কাদিও বোয়োন্দিয়াকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই গভীর ইঙ্গিতবহ কথা বলত সে। যেমন, 'সময়ের যন্ত্রটা ভেঙে গেছে,' 'আজকের দিনটাও সোমবার।' হোসে আর্কাদিও বোয়েন্দিয়ার পাগলামির কারণ মনে হতে পারে সময় ও সমাজ স ম্পর্কে এক ধরনের অতি-চেতনা। তাঁর অনুভবে, সময় স্থবির, লয়হীন। এরকম অতিচেতনাও কখনো হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গতার পরিবাহী।

মোটের ওপর, গার্সিয়া মার্কেসের অদম্য তাগিদ স্বভূমির পায় সমস্ত বিষয় যা তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারে, তাকে ফুটিয়ে তোলা। তাঁর (linear narrative পাঠককে যেন বশ করে ফেলে। পাঠক পড়তে বাধ্য হন নানা অলৌকিক ঘটনায় ভরা বোযেন্দিয়া পরিবারের ইতিবৃত্ত, যে পরিবারে অজ াচার (incestuousness) এক গ্রাহ্য বিষয়, যদিও একটা সাবধানবাণী ছিল, পরিবারের সবাই জানতোও সেটা যে, তীব্র অজাচার চলতে থাকলে একদিন কোন এক শিশু শুয়োরের লেজের মতো লেজ নিয়ে জন্মাবে। আউরেলিয়ানো ও আমারন্তা উরসুলার ছেলে সেভাবেই জন্মাচ্ছে। পাঠক কি বলবেন এই ব াস্তবকে? পাঠক যাই ভাবুন, গার্সিয়া মার্কেস কিন্তু এই বাস্তবেই পুষ্ট, সংহত, যে-বাস্তবে সমবেত মানুষের কণ্ঠস্বর বৃষ্টি বয়ে আনে, তীব্র ঝড়ে উড়ে যায় আস্ত একটা সার্কাস, কখনো একটা শহর, খবরের কাগজের সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে লেজ নিয়ে জন্মানো শিশু।

গার্সিয়া মার্কেসের বেশ কিছু ছোটগল্পেও ঘটেছে যাদু-বাস্তবতার প্রতিফলন। আমরা স্মরণ করতে পারি 'নাবো', যে কালো-মানুষটা দেবদূতের অপেক্ষায় বাধ্য করেছিল' এবং 'এক ভূতুড়ে জাহাজের শেষ যাত্রা' নামে দুটি গল্প। শেযোক্ত গল্পে অপরিমিতকাল ধরে অন্ধকারে চরেবেড়ানো পথভোলা এক ভৌতিক জাহাজকে ব াস্তবের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে একটা ছেলে। গার্সিয়া মার্কসও যেন দীর্ঘ উপেক্ষিত এই জাহাজী বাস্তবকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন, যে বাস্তবকে শুতে গ্রাহ্য করেনি য়ুরোপ আমেরিকা প্রভাবিত যুক্তিবাদী দুনিয়া। গার্সিয়া মার্কেস এবং তাঁর নিকট পূর্বসুরী ও সমসাময়িকদের দাপটে সমস্ত একপেশে যুক্তিবাদিতার দেওয়াল আজ ভেঙে পড়ছে, এটাই আশার কথা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com